প্রথম অধ্যায়

প্রাচীন পূর্ববঙ্গগীতিকা ঃ আর্থসামাজিক প্রেক্ষিত

খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর গুপ্ত-শাসনকালকে বৈদিক সভ্যতার সুবর্ণযুগ বলে অ্যাখ্যায়িত করা হয়। গুপ্তশাসনকালে কামরূপ অঞ্চল ছিল মগধের শাসনাধীন। এই সময় মগধের রাজসিংহাসনে আসীন ছিলেন গুপ্ত সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত।

> *"খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে সমুদ্রগুপ্ত মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। সমুদ্রগুপ্তের সময়ের একখানা খোদিত লিপিতে অবগত হওয়া যায় যে - কামরূপ, সমতট প্রভৃতি প্রত্যন্ত নৃপতিগণ সমুদ্রগুপ্তকে করপ্রদান করিতেন ও তাঁহার আদেশ সমূহ প্রতিপালন করিতেন''* [১]

গুপ্ত শাসনকালে এই কামরূপ অঞ্চল মগধের শাসনাধীনেই ছিল। আর 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র পালাগুলির অধিকাংশের ভিত্তিভূমি বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চল ছিল কামরূপের অধীনে। এই সময় কামরূপে পুরোপুরি বিকশিত আর্যসভ্যতার শাসন দণ্ড ছিল বর্ণহিন্দুদের করতলগত কাজের সুবিধার জন্য তারা প্রশাসনিক কাজকে তিনভাগে বিভক্ত করেছিলেন - বিচার প্রশাসন, অর্থনীতি ও নিম্নবিত্তের কর্ম নিয়ন্ত্রণ। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভূত উচ্চবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা জন্মগতভাবে বিচার বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন। গুপ্তযুগে সৃষ্ট পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে সমাজের বিচার ও প্রশাসন নিয়ন্ত্রিত হত। পঞ্চায়েতের সদস্যরা আত্মস্বার্থ চরিতার্থ করতে গিয়ে বিচার ব্যবস্থাকে একদেশদর্শী করে তুলেছিল। কারুর প্রতি কোনো অবিচার হলেও পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে কেউ কোনোরকম টুঁশব্দ পর্যন্ত করতে পারত না। সাধারণত বৈশ্য সম্প্রদায়রাই অর্থনৈতিক কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণ করত। শূদ্র বংশজাত হিন্দুরা সাধারণত নিম্নবৃত্তির কাজ করত এবং উচ্চবর্ণের লোকদের সেবাদান করত। জাতিভেদ প্রথার নিগড়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য উচ্চবর্ণ গোষ্ঠী, নিম্নবর্ণ তথা তাদের ভাষায় অস্পৃশ্যদের উপর শাসন চালাত। খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দী থেকে খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে তথা বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলে এইরূপ সামাজিক অবস্থা প্রচলিত ছিল।

খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে আনুমানিক ৬২৯ থেকে ৬৪৫ অব্দে পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ্ ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে পরিভ্রমণ করেন। কামরূপ এসময় একটি ক্ষমতাপন্ন রাজ্য রূপে পরিগণিত হত। দুই সহস্র মাইল বিস্তৃত এই কামরূপ অঞ্চলকে প্রত্নতত্ত্ববিদ শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় আসাম, মণিপুর, ময়মনসিংহ, কাছাড় ও শ্রীহট্টের সমষ্টি বলে উল্লেখ করেছেন। হিউয়েন সাঙ্ এর বিবরণ পাঠ করে জানা যায় যে -

> *"এই প্রদেশের ভূমি তখন অতিশয় উর্ব্বরা ও শস্যপূর্ণা ছিল। এদেশে প্রচুর নারিকেল ও ধান্য উৎপন্ন হইত। নগরের চারিদিকে পয়ঃপ্রণালী দ্বারা জল প্রবাহিত হইত; জলবায়ু ও সাধারণ স্বাস্থ্য ভালো ছিল এবং দেশের লোকের চরিত্র উন্নত ও সভ্য ছিল। কামরূপ রাজ্য তৎকালে কুমার ভাস্কর বর্মন নামক রাজা কর্তৃক শাসিত হইতেছিল।''*[২]

খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত পাল রাজারা বঙ্গদেশ শাসন করেছিলেন।

> *"এইসময় ময়মনসিংহের দক্ষিণ অংশে বর্তমান কাপাসিয়া রায়পুরা ও ধামবরাই নামক স্থানে যথাক্রমে শিশুপাল, হরিশ্চন্দ্র পাল ও যশোপাল বংশীয়*

তিনজন ক্ষুদ্র নরপতির রাজ্য অল্পে অল্পে প্রসারিত হইতেছিল।'' [৩]

পরপর তিনজন পালরাজা এই অঞ্চল শাসন করার পর এই অঞ্চলের শাসনভার চলে যায় সেন রাজাদের অধীনে। ইখতিয়ার উদ্দিন মহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজির বঙ্গবিজয়ের পর ও প্রায় একশত বছর ময়মনসিংহ সেন রাজত্বের অধীনে ছিল।। তখন পশ্চিম ময়মনসিংহের শাসনভার পরিচালনা করছিলেন সম্রাট বল্লালসেন।

শাসনভার গ্রহণ করার পর বল্লাল সেন নিজরাজ্যে কৌলিণ্য প্রথার বিবর্তন করেন। এরফলে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থগণ ক্ষোভে-দুঃখে বল্লাল সেনের বিরোধিতা করতে শুরু করে। ঠিক এই সময় বল্লাল সেন অসবর্ণা ডোমকন্যাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করলে বিরোধিরা জাতি রক্ষার্থে সর্বস্ব ত্যাগ করে কেবলমাত্র স্ত্রী-পুত্র নিয়ে ভিন রাজ্যে প্রস্থান করেছিল।। এইসব জাতিচ্যুত ভয় বিহ্বল ব্যক্তিগণ ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট, পূর্বময়মনসিংহ প্রভৃতি বল্লাল সেন বহির্ভূত প্রদেশে এসে বসবাস করতে শুরু করেছিল। এরপর খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কামরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূঞা রাজ্যে বিভক্ত হয়ে যায। এইসময় পূর্ব ময়মনসিংহের অরণ্যভূমিতে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের উদ্ভব হয়। কিশোরগঞ্জের অন্তর্গত জঙ্গল-বাড়ি, নেত্রকোণার অন্তর্গত খালিয়াজুরি, মদনপুর, সুসঙ্গ, সদরের অন্তর্গত বোকাইনগর, জামালপুরের অন্তর্গত গড়দলিপা প্রভৃতিস্থানে বল্লালী প্রথায় বিতাড়িত নিম্নবর্গের উপজাতীয় জনগোষ্ঠী বিশেষতঃ কোচ, হাজং, গারো, বানাই, হদি প্রভৃতিরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য গড়ে তোলে। এইসমস্ত রাজ্যের শাসনকার্য পরিচালনা করতেন সামন্ত রাজারা। এই সামন্ত রাজারাই পরবর্তীকালে জমিদার বা ভূঞা খেতাবে ভূষিত হন। এইসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের উপজাতি গোষ্ঠীগুলি ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি, বিশ্বাস ও সংস্কারের দিক থেকে পৃথক ঐতিহ্যের অধিকারী হয়ে ওঠে। ময়মনসিংহ অঞ্চলে প্রায় ৪৫ টি আদিবাসী উপজাতি জনগোষ্ঠীর পরিচয় পাওয়া গেলেও উল্লেখযোগ্য আদিবাসী উপজাতিগুলি হল - কোচ, গারো, হাজং, হদি ও বানাই।

বহিরাগত উপজাতিগুলির মধ্যে কোচরাই সর্বপ্রথম ময়মনসিংহ অঞ্চলে বসবাস শুরু করে। তবে নেত্রকোণা অঞ্চলে অধিকসংখ্যক কোচ উপজাতির মানুষ বসবাস করতেন। কোচরা মোঙ্গলীয় জনগোষ্ঠীর বংশধর বোড়ো উপগোষ্ঠীভূক্ত। প্রখ্যাত সমালোচক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে পূর্ব ময়মনসিংহ অঞ্চলে মধ্যযুগ পর্যন্ত বোড়ো রা কোচ নামে পরিচিত ছিল। প্রথম দিকে কোচরা প্রাকৃতিক শক্তির উপাসনা করত কিন্তু কালক্রমে এরা হিন্দুদের কাছে নিজেদেরকে ক্ষত্রিয় বলে পরিচয় দিত। নিজস্ব ভাষা-সংস্কৃতি থাকলেও এরা সাধারণের সঙ্গে মিলেমিশে বসবাস করত। কোচদের সমাজে দশ বছর হলেই মেয়েরা বিবাহযোগ্যা হত। তবে কন্যাকে বিবাহ করতে হলে পাত্র পক্ষকে কন্যাপণ দিতে হত।

> *"পূর্ব ময়মনসিংহের জনগোষ্ঠীর প্রধান উপাদান কোচ, এরা উদ্ভূত হয়েছে ইন্দো মোঙ্গলয়েড জাতির অন্যতম শাখা বোড়ো জাতি থেকে। মাতৃতান্ত্রিক (Matriarchal) বোড়ো জাতির বৈশিষ্ট্য। মাতৃতান্ত্রিক সমাজ স্ত্রী প্রধান, গীতিকাগুলিতে তাই স্ত্রী চরিত্রের প্রাধান্য। স্ত্রী প্রধান সমাজে স্বাধীন প্রেমের মর্যাদা স্বীকৃত। গীতিকাগুলিতে অনূঢ়া কন্যাদের নিজেদের পছন্দমতো জীবনসঙ্গী নির্বাচন, নির্বাচিত সঙ্গীর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া ইত্যাদি বিষয় বর্ণিত হয়েছে, তার ভিত্তি এই মাতৃতান্ত্রিক সমাজ।''* [৪]

গারো সাধারণত যাযাবর উপজাতি। ৬২৯ খ্রীঃ চীনা পর্যটক হিউয়েম সাঙ্ এর বিবরণ জানা যায় যে, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক নানাবিধ কারণে গারো অধিবাসীরা তিব্বত অঞ্চল থেকে নানাস্থানে ছড়িয়ে পড়ে। গারোদেরও সমাজ ছিল মাতৃতান্ত্রিক। মায়ের পর মেয়েরাই সম্পত্তির মালিক হত। বিবাহের পর ছেলেরা শ্বশুরবাড়ি চলে যেত। ছেলেমেয়েরা মায়ের পদবী গ্রহণ করত। গারোরা মূলতঃ কৃষিজীবী। ঝুম্চাষ

করে এরা জীবিকা নির্বাহ করত। পরবর্তীকালে এরা ধান, ভূট্টা, সরষে, শাকসব্জী, সুতোতৈরী, রংতৈরী, কাপড়বোনা, বেতের দ্রব্যাদি তৈরী, চেয়ার-টেবিল ইত্যাদি আসবাবপত্র তৈরী করে জীবনজীবিকা নির্বাহ করত। এদের সংস্কৃতি ছিল বেশ উন্নত। পূজা-পার্বন ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে নৃত্য, গীত পরিবেশিত হত। হাজং উপজাতি মঙ্গোলিয়ান জনজাতি গোষ্ঠীর মানুষ হওয়ার কারনে চীন থেকে তিব্বত হয়ে এরা আসামের হাজো অঞ্চলে বসবাস শুরু করেছিল। কৃষিজীবী এই উপজাতি মাটি কর্ষণ করে চাষবাস করত বলে গারোরা তাদেরকে হাজং বলত। গারোদের ভাষায় হা-এর অর্থ মাটি এবং জং এর অর্থ পোকা। সেকারণে গারোরা ব্যাঙ্গার্থে তাদেরকে হাজং বলত। উত্তরপূর্ব সীমান্তের চীন মঙ্গোলীয় বংশের উপজাতীয় গোষ্ঠী হদি সম্প্রদায় ছিল বোড়ো ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ। খগেশকিরণ তালুকদারের মতে-

> *"ময়মনসিংহের উত্তর প্রান্তের সকল কৌমগুলোর মধ্যে হদিদের সঙ্গে বাঙালিদের পরিচয় সর্বাগ্রে। আর বাঙালিদের সংস্পর্শে তারা তাদের নিজস্ব ভাষা বর্জন করে ও ক্রমে হিন্দু সমাজের একপ্রান্তে আশ্রয় নেয়।"*[৫]

বানাই উপজাতিরা মূলতঃ মঙ্গোলিয়ান নর সমাজের অন্যতম শাখা। অনেকের মতে বানাইরা কোচদেরই একাংশ।

পূর্ব ময়মনসিংহ অঞ্চলে বিশেষতঃ কোচ, গারো, হাজং, হদি, বানাই - প্রভৃতি উপজাতীয় লোকেরা কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য গড়ে তোলে। জঙ্গলবাড়ি, খালিয়াজুড়ি, ভাটি, মদন, সুসংগ, বোকাইনগর ও শেরপুর থেকে সামন্ত রাজারা এইসমস্ত রাজ্যের শাসন কার্য পরিচালনা করত। এইসব সামন্ত রাজারাই পরবর্তীকালে জমিদার বা ভূঞা খেতাবে ভূষিত হন। ১৪৯১ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় ফিরোজ শা বাংলার স্বাধীন সিংহাসনে আরোহণ করে সেনাপতি মজলিশ খাঁকে ময়মনসিংহ আক্রমণের নির্দেশ দেন। মজলিশ খাঁ ময়মনসিংহের উত্তরভাগে প্রবেশ করে শেরপুর প্রদেশ আক্রমণ করে। শেরপুরের কোচ রাজা দলিপ সামন্ত মজলিশ খাঁ এর হাতে পরাজিত ও নিহত হন। ফলস্বরূপ শেরপুরের গড়দলিপায় ১৪৯১ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম মুসলিম রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে আলাউদ্দিন হোসেনশাহের আমলে সমগ্র ময়মনসিংহ অঞ্চল মুসলমানদের অধীনস্থ হয়। সুলতান হোসেনশাহের মৃত্যুর পর তার সুযোগ্য পুত্র নাসিরউদ্দিন নুসরত্ শাহ গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তার শাসনকালে ষোড়শ শতকের গোড়ার দিকে ব্রহ্মপুত্র নদের পশ্চিমতীরে নাসিরাবাদ নগর স্থাপিত হয়। অনুমিত হয় যে, নাসিরাবাদ নগর নাম থেকে নুসরত্শাহী কথাটি উৎপত্তি হয়েছে।

১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে দাউদ খাঁর পরাজয় ঘটলে বাংলার শাসনভার চলে যায় মুঘলদের হাতে। তবে আকবরের আমলের ওয়াজির খান থেকে, বাহাদুর শাহের আমলের মুর্শিদকুলি খান পর্যন্ত দেওয়ানেরা বাংলার বুকে নিশ্চিন্ত শাসন চালাতে পারেন নি। 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র বিভিন্ন পালার অবয়বে সমসাময়িক রাজনৈতিক জীবনের যে স্বরূপ লক্ষিত হয়, তা একেবারেই অস্থিরতা নির্ভর। তবে বাংলা মুঘল অধিকারে যাওয়ার পরেও মুঘল সম্রাট আকবর সমস্ত বাংলায় নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন নি। এই সময় পূর্ববাংলার অনেক বড়ো বড়ো জমিদারগণ নিজ নিজ এলাকায় স্বাধীনভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। স্বাধীনতা রক্ষার জন্য এদের মধ্যে মিত্রতা ও ছিল। এইসমস্ত জমিদারগণই ইতিহাসে বারোভূঁইয়া নামে পরিচিত। এইসময় আর্থিক, নৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন বিপর্যস্থ হয়ে পড়েছিল। ময়মনসিংহ, ঢাকা ও ফরিদপুরের বারোভূঁইয়াদের শায়েস্তা করবার জন্য সম্রাট আকবর ১৫৮৩ খ্রীষ্টাব্দে শাহবাজ খানকে, ১৫৮৪ খ্রীষ্টাব্দে সাদিক খানকে, ১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দে উজিরখানকে এবং ১৫৯৪ খ্রীষ্টাব্দে রাজা মানসিংহকে বাংলায় পাঠান। বারোভূঁইয়াদের অনেকেই এদের হাতে পরাজিত হলে ও তাদের নেতা ইশা খানকে পরাজিত করা সম্ভব হয় নি। এরপর ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ইশা খানের মৃত্যুর পর মুসা খান নেতা হন। ১৬০১ খ্রীষ্টাব্দে আকবর দ্বিতীয়বার

মানসিংহকে বাংলায় পাঠান বারোভূঁইয়াদের দমন করবার জন্য। এবার অবশ্য মানসিংহ অনেকটাই সফল হন। তবে আকবরের পুত্র জাহাঙ্গীর স্থায়ীভাবে বারোভূঁইয়াদের দমন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই বারোভূঁইয়ারা যখন মুঘলশাসনকে ঠেকিয়ে রেখেছিল, তখন বাংলায় অপশাসনে মানুষ যে কী প্রকার বিপর্যস্থ হয়ে পড়েছিল প্রখ্যাত সমালোচকের মন্তব্যে তা স্পষ্ট হয় -

> *১৫৭৫ সনের যুদ্ধে বাংলা নামত মুঘল অধিকারে গেল বটে কিন্তু দ্রোহী সামন্ত ভূঁইয়ারা ১৬৭৭ সন অবধি গোটা বাংলার সর্বব্যাপী মুঘল শাসন ঠেকিয়ে রেখেছিলেন, ফলে অপশাসনে, দুঃশাসনে,দ্রোহে ও নৈরাজ্যে দেশের মানুষ জানেমালে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিপর্যস্থ হয় আর্থিক, নৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন।'*[৬]

সমাজ অর্থনীতির দিক থেকে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে সামন্ততান্ত্রিক শাসনকাঠামোয় 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকার' পালাগুলিতে চার শ্রেণীর মানুষের অস্তিত্ব আছে - শাসকশ্রেণী, বণিকশ্রেণী, কৃষকশ্রেণী এবং বৃত্তিজীবী মানুষ। শাসক শ্রেণীর মানুষ বলতে প্রধানতঃ নবাব, জমিদার, দেওয়ান, রাজা, কাজী, চাকলাদার প্রভৃতিদেরকে বোঝানো হত। শাসকশ্রেণীর মানুষরাই সমাজের শাসক ও শোষক ছিল। উচ্চাকাঙ্খা ও ষড়যন্ত্র প্রয়াসই এদের মূল লক্ষ্য ছিল। আত্মস্বার্থ চরিতার্থ করবার জন্য এরা চলার পথে যাবতীয় বাধাকে সরাতে কাউকে নারকীয় ভাবে হত্যা করতে ও পিছুপা হত না। অর্থই অনর্থের মূল। এই শ্রেণীর হাতে অত্যধিক অর্থ ও ক্ষমতা থাকায় এরা কামনা বাসনায় আচ্ছন্ন হয়ে সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার করত এবং অসামাজিক জীবন যাপন করত। আর্থিক স্বচ্ছলতার মাপকাঠিতে সমাজের দ্বিতীয় পর্যায়ে ছিল বণিকশ্রেণী।। সামাজিকভাবে উপরতলার অধিবাসী এই বণিকশ্রেণীর সঙ্গে শাসক শ্রেণীর সম্পর্ক ছিল দ্বন্দ্বাত্মক। উচ্চাকাঙ্খা ও সম্পদের মোহের ক্ষেত্রে এরা শাসক শ্রেণী থেকে কোনো অংশে পিছিয়ে ছিল না। বণিক শ্রেণীর মধ্যে যারা অর্থবলে বলীয়ান হয়ে উঠত, তাদের মধ্যে ন্যায়বোধের বিন্দু বিসর্গ অবশিষ্ট থাকত না। সমাজের তৃতীয় পর্যায়ে অবস্থিত কৃষকশ্রেণীর আন্তরিকতা ও একনিষ্ঠতা নিয়ে কোনো সন্দেহ ছিল না। এরা যেমন ছিল সহজ সরল তেমনি ছিল স্থবির, উচ্ছ্বাসহীন ও সংকীর্ণ। কৃষকদের মধ্যে দুটি উপবিভাগ ছিল - সম্পদশালী উচ্চবিত্ত কৃষকশ্রেণী এবং পরিশ্রমজীবী সাধারণ কৃষকশ্রেণী, সমাজের প্রান্তিক স্তরের বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত মানুষরা হল সমাজের চতুর্থ পর্যায়ভূক্ত বৃত্তিজীবী শ্রেণীর প্রতিনিধি। বৃত্তিজীবী মানুষ বলতে বংশীবাদক, রাখাল, মৎস্যজীবী, ঘটক, পালকিবাহক, ওঝা, ডাকাত, পুরোহিত, গোয়ালিনী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মানুষকে বোঝানো হত।

সম্রাট আকবর সমগ্র বঙ্গদেশ মোঘল শাসনাধীনে আনতে পারেন নি। জাহাঙ্গীর বঙ্গদেশকে শাসনাধীনে আনার অব্যবহিত পরেই ইহলোক ত্যাগ করেন। সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে শাহ সুজা রীতিমত বাংলার কর আদায় করতে শুরু করেন। মুঘল শাসনকালে আইন কানুনের প্রাদুর্ভাব ছিল সত্য কিন্তু তা অতি অল্প পরিমাণে কার্যকর হত। এ সময় বাংলাদেশে অত্যাচারের সীমা পরিসীমা ছিল না। রাজকর্মচারীরা নিজেদের উপার্জনের চিন্তায় প্রতি মুহূর্তে প্রজার কষ্টে উপার্জিত অর্থ শোষণে ব্যস্ত থাকত। আবার প্রাণরক্ষার জন্য প্রজারা যথাসর্বস্ব ত্যাগ করতে দ্বিধা করত না। তবে এইসময় যে শুধুমাত্র প্রজাদের দুর্দশা ছিল তা নয়, জমিদারদের ও দুরবস্থার অন্ত ছিল না। জমিদাররা নির্দিষ্ট সময়মতো খাজনা পরিশোধ করতে না পারলে, জমিদারদের আবর্জনাপূর্ণ গর্তে নিক্ষেপ করা হত। অনেক সময় প্রজারা সর্বস্ব হারিয়ে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে গতর খাটিয়ে দিনাতিপাত করত। কিন্তু জমিদাররা খাজনা দিতে অসমর্থ হলে লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ করে অর্ধাহারে - অনাহারে গ্রীষ্মকালে প্রখর রৌদ্রে, শীতকালে শীতলজলে এবং রাত্রে উপরের দিকে পদদ্বয় বন্ধন অবস্থায় আবর্জনা স্তুপে ফেলে রাখা হত। এই অবাধ অত্যাচারের কাছে পদমর্যাদার কোনো মূল্য ছিল না।

মোঘল শাসনকালে প্রদেশগুলো সুবা নামে পরিচিত ছিল। ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সুবাদারী শাসনব্যবস্থার মধ্যে জমিদারী শাসনব্যবস্থা চালু ছিল। মোমেনসাহি, আলেপসাহি ও হোসেনসাহি সহ সমগ্র ময়মনসিংহ অঞ্চল এই জমিদারী শাসনব্যবস্থার আয়ত্তাধীন ছিল। ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সুবা বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন মুর্শিদকুলি খান। মুর্শিদকুলি খানই প্রথম রাজস্ব আদায় ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের জন্য বাংলার দেওয়ান নিযুক্ত হন।

আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর দুর্বল চিত্ত মোঘল সম্রাটগণ সুবাগুলির দিকে তেমন নজর দিতে পারেন নি। এই সুযোগে মুর্শিদকুলি খান অনেকটা স্বাধীনভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করতে শুরু করেন। ১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দে মুর্শিদকুলি খানের মৃত্যুর পর জামাতা সুজা উদ্দিন খান বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। সিংহাসনে বসে সুজা উদ্দিন তার আত্মীয় স্বজন ও বিশ্বাসভাজন লোকদের প্রশাসনের উচ্চপদে নিয়োগ করেন। তার সময়েই মুক্তাগাছা ও গৌরীপুরের জমিদাররা পাকাপাকিভাবে ময়মনসিংহের জমিদারী লাভ করেন। তবে মুর্শিদকুলি খান এবং তার জামাতা রাজস্ব আদায়ের জন্য জমিদারদের বিশেষতঃ হিন্দু জমিদারদের উপর নির্মম অত্যাচার করত। ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যে তার প্রমাণ মেলে —

> *"মুর্শিদকুলি এবং তাহার জামাতা জমিদারদের নিকট প্রাপ্য রাজস্ব আদায়ের জন্য কোনো কোনো সময় নির্মম অত্যাচার করিতেন। জমিদার হিন্দু হইলে তাঁহাকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য করা ও হইত। তাহার জামাতা সৈয়দ রাজি খাঁ একটা গর্ত খুঁড়িয়া তাহা মলমূত্রে পূর্ণ করিয়া রাখিতেন। হিন্দুর মনে আঘাত দিবার জন্য রঙ্গ করিয়া তাহার নাম দেওয়া হইয়াছিল 'বৈকুণ্ঠ'। যে হিন্দু জমিদার যথাসময়ে রাজস্ব দিতে পারিতেন না। তাঁহাকে ঐ বৈকুণ্ঠে ডুবাইয়া রাখা হইত।'"*[৭]

মুসলমান শাসক দিগের মধ্যে মুর্শিদকুলি খানই অত্যধিক অত্যাচারী ছিলেন। তার শাসনভয়ে কোচবিহার, ত্রিপুরা প্রভৃতি রাজ্যের প্রতাপশালী নৃপতিগণ তাকে নানাপ্রকার উপঢৌকোন পাঠিয়ে সন্তুষ্ট রাখবার চেষ্টা করতেন। সুবা বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়ে মুর্শিদকুলি খান অধিক মাত্রায় রাজস্ব আদায় করতে শুরু করেন। রাজস্ব আদায়ের জন্য তিনি জমিদারদের উপর নির্মম অত্যাচার চালাতেন। আর জমিদারগণ ও জনসাধারণের কাছ থেকে অধিক রাজস্ব আদায় করতে গিয়ে ততোধিক অত্যাচার চালাতেন।

''মুর্শিদকুলি খানের সময়ে (১৭০৪-১৭২৭খ্রীঃ) খাজনার হার ফসলের অর্ধাংশ ধার্য করা হয়।" [৮]

তার সময়ে জমিদারগণ বৈকুণ্ঠবাসের ভয়ে প্রাণের বিনিময়ে জমিদারী এবং এমনকি জাতিত্যাগ করতে ও বাধ্য হত। ১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দে শেরপুরের জমিদার সূর্যনারায়ণ চৌধুরীর প্রদত্ত রাজস্বে ত্রুটি দেখা দেওয়ায় তাকে বিবস্ত্র করে এমন উৎপীড়ন করা হয়েছিল যে তিনি জীবনভিক্ষা করে জমিদারীতে ইস্তফা দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। আবার কাগমারীর জমিদার ইন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী রাজস্ব প্রদান করতে অক্ষম হলে তাকে পৈতৃক নাম ও ধর্ম পরিত্যাগ করে এনাতুল্য চৌধুরী নাম নিয়ে মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করতে হয়। রাজস্ব অনাদায় হেতু নাবালক রাজা কিশোর সিংহ ও রাজসিংহ এর প্রতি যে অত্যাচার হয়েছিল তা শ্রবণ করলে পাষাণ হৃদয় ও বিগলিত হয়ে যায়।

রাজস্ব সংগ্রহ ও বিলি ব্যবস্থা পরিচালনার ক্ষেত্রে মুর্শিদকুলি খান, মুসলমান কর্মচারী অপেক্ষা অমুসলমান হিন্দু কর্মচারীদের অধিক বিশ্বাস করতেন। সেকারণে ইজারদারদের পদে ও দেওয়ানি বিভাগে তিনি যতটা সম্ভব হিন্দু কর্মচারী নিয়োগ করতেন। তবে মুর্শিদকুলি খানের মৃত্যুর পর তার সুযোগ্য জামাতা সুজাউদ্দিন

সৎ ও দক্ষ শাসক হিসাবে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন।

> *"১৭৩৯ সালে এক টাকায় আটমন সাধারণ মানের চাল কেনা যেত। এবং সেই সুবাদে নাকি ঢাকা শহরের পশ্চিমদ্বার খুলে দিয়েছিলেন নবাব সুজা উদ্দিন। কথিত আছে যে সুবাদার শায়েস্তা খানের (১৬৭৯-১৬৮৮) সময় একবার চালের মূল্য টাকায় আট মনে নেমে এসেছিল। তখন তিনি শহরের পশ্চিম তোরণ বন্ধ করে দম্ভভাবে ঘোষণা দেন যে, ভবিষ্যতে তখনই ঐ তোরণ আবার খোলা যাবে, যখন চালের মূল্য ঐ পর্যায়ে নেমে আসবে।"*[৯]

এরপর সুজা উদ্দিনের মৃত্যুর পর তার পুত্র সরফরাজ খান বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব হয়ে বসলে ও সৎ ও দক্ষ শাসক হিসাবে কোনো যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারেন নি। এরফলে দেশজুড়ে প্রবল বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এই সুযোগে ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে মোঘল সম্রাটের অনুমতি নিয়ে বাহুবলে সরফরাজ খানকে পরাজিত ও নিহত করে আলিবর্দী খান বাংলার নবাব হন। ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় সাত বছর বাংলায় মারাঠা লুটেরা বর্গীরা এমন অমানুষিক অত্যাচার চালিয়েছিলেন যে, নবাব আলিবর্দী খান ও তা প্রতিহত করতে পারেননি। বস্তুতঃ অর্থনৈতিক, সামাজিক, নৈতিক সবদিকে দিয়েই বর্গীর আক্রমণ বাঙালির মনে তীব্র বিতৃষ্ণা, ঘৃণা ও সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছিল। তবে অল্প কালের মধ্যেই আলিবর্দী খান বর্গী ও মারাঠা দস্যুদের বাংলা থেকে বিতাড়িত করে বাংলায় স্থায়ী শান্তি ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন।। শাসনকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে আলিবর্দী খান, মুর্শিদকুলি খানের মতো মুসলিম কর্মচারী অপেক্ষা হিন্দু কর্মচারীদের অধিক বিশ্বাস করতেন -

> *"কারণ মুসলমান কর্মচারীরা অনেকসময় আদায়ী রাজস্বের হিসাব দিতে পারিত না। কেহ বা ইহার অনেকটা লোভে পড়িয়া হজম করিয়া ফেলিত।"* [১০]

তবে রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে আলিবর্দী খান প্রাপ্যের অতিরিক্ত অর্থ দাবী করতেন না। এমনকি রাজস্ব সংগ্রহের ব্যাপারে প্রজাদের উপর অত্যাচার করতেন না। তবে ধূর্ত দেওয়ান ও সুবাদাররা অনাবাদী জমিকে চাষযোগ্য জমি বলে উচ্চহারে রাজস্ব আদায় করতেন। অনেকক্ষেত্রে অর্থ বলে বলীয়ান হয়ে ইজারাদাররা জমিদার হয়ে বসলে, তাদের অত্যাচারে সাধারণ মানুষের জীবন দূর্বিষহ হয়ে উঠত। এরপর দেশের শত্রু বর্গীদের বিতাড়নের কারণে, যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহের জন্য আলিবর্দী খান জমিদারদের এবং ইংরেজ বণিকদের কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করতে শুরু করলে জমিদাররা ও প্রজাদের কাছ থেকে অতিরিক্ত রাজস্ব আদায় করতে শুরু করে। ফলস্বরূপ একদিকে প্রজা সাধারণ সর্বশান্ত হত এবং অন্যদিকে জমিদারগণ আলিবর্দীর বিরুদ্ধে গোপনে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হত। ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে কর্নেল স্কট তাঁহার এক বন্ধুকে লেখেন ——

> *"Jentee (i.e.Hindoo) Rejahas and inhabitants were much disaffected to the Moor (i.e.Muhammedan) Government and secretly wished for a change and oppertunity of throwing off their tyrannical yoke."* [১১]

মুর্শিদকুলি খান এবং আলিবর্দী খান নিষ্ঠাবান মুসলিম ছিলেন বলে শাসন ব্যাপারে কোনো প্রকার ধর্মীয় গোঁড়ামির প্রশ্রয় দিতেন না। শাসনকার্য পরিচালনার ব্যাপারে দুজনই মুসলিম কর্মচারী অপেক্ষা হিন্দু কর্মচারীদের উপর অধিক বিশ্বাস ও আস্থা রাখতেন। এই সময় হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় ছিল। মুসলমান নবাব, আমির-ওমরাহরা দোল উৎসবে সমবেত হয়ে পিচকারিতে রঙিন গুলাব জল ভরে রং খেলায় মেতে উঠতেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, আলিনগরের সন্ধির পর সিরাজদৌল্লা মুর্শিদাবাদে ফিরে এসে

সানন্দে দোল উৎসবে যোগ দিয়েছিলেন। অন্যদিকে হিন্দুরা মুসলমান পীর ফকিরদের যেমন শ্রদ্ধা করতেন, তেমনি তাদের ধর্মগ্রন্থ কোরানকে নিজেদের ধর্মগ্রন্থের মতো শ্রদ্ধা করতেন। এমনকি হিন্দুরা সত্যপীরকে সত্যনারায়ণ জ্ঞানে পূজা ও করতেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বহুমুসলিম কবি তাঁদের কাব্যরচনার প্রারম্ভে হিন্দু দেবদেবীর বন্দনা গান গেয়েছেন। আবার ভাগলপুর সহ বহুস্থানে হিন্দু-মুসলমান একসঙ্গে সবুজ পোষাক পরে মহরম উৎসবে যোগ দিতেন। তবে 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকার' 'পীরবাতাসী কন্যার পালা', 'মলয়া কন্যার পালা', 'ছুরত জামাল-অধুয়া সুন্দরী পালা' প্রভৃতি পালায় সংযোজিত বন্দনা অংশে হিন্দু-মুসলমানদের দেবতা ও পীরের সহাবস্থান দেখে অনুমান করা যায় যে, গীতিকার পালাগুলি রচনার প্রাক্কালে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় ছিল। তবে সে সময়কার সমাজ ছিল রক্ষণশীল।

মৃত্যুর আগেই আলিবর্দী খান তাঁর সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হিসাবে কনিষ্ঠা কন্যা আমেনা বেগমের পুত্র সিরাজউদ্দৌলাকে মনোনীত করে যান। কিন্তু আলিবর্দীর প্রথমা কন্যা ঘষেটি বেগমের ইচ্ছা ছিল দ্বিতীয় ভগ্নীর পুত্র সওকত জংকে নবাব বানানো। আত্মস্বার্থ চরিতার্থ করতে না পেরে ঘষেটি বেগম রায়দুর্লভ, মিরজাফর, রাজবল্লভ প্রমুখ অভিজাতদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে প্রাসাদ অভ্যন্তরে সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করেন। সচতুর ইংরেজ বণিকরা ষড়যন্ত্রকারীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সিরাজউদ্দৌলার আদেশ অমান্য করতে শুরু করে। এর ফলস্বরূপ ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ শে জুন ষড়যন্ত্রকারীদের সঙ্গে সিরাজউদ্দৌলার যুদ্ধ বেধে যায়। সিরাজউদ্দৌলার সেনাপতি মিরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় পলাশীর প্রান্তরে এই যুদ্ধে অসহায়ভাবে নবাবের পরাজয় ঘটে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, পলাশীর যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলায় ইংরেজ শাসনের ভিত্তি স্থাপিত হয়। এইসময় পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষতঃ ময়মনসিংহ অঞ্চলের মুক্তাগাছা ও গৌরীপুরে হিন্দু জমিদারী শাসন চলছিল। বিশ্বাসঘাতক মিরজাফর বাংলার নবাব হয়েও ইংরেজদের হাতের পুতুল হয়ে রইলেন। চাহিদামতো অর্থ দিতে না পারায় ইংরেজরা অনতিবিলম্বেই মিরজাফরকে সিংহাসন চ্যুত করে তারই জামাতা মীরকাশিমকে বাংলার মসনদে বসান। কিন্তু স্বাধীনচেতা মীরকাশিম ইংরেজদের হাতের পুতুলে পরিণত হতে না চাইলে যুদ্ধ অবসম্ভাবী হয়ে ওঠে। ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে মীরকাশিম ইংরেজদের হাতে পরাজিত হয়ে সিরাজউদ্দৌলা এবং বাহাদুর শাহের সাহায্য নিয়ে শেষ বারের মতো বাংলায় স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন। ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে বক্সারের যুদ্ধে মীরকাশিমের এই বিশাল মিলিত বাহিনী ইংরেজ শক্তির কাছে পরাজিত হয়। এরপর শাসনক্ষমতা নিজেদের হাতে রেখে ইংরেজরা বহুসুবিধা দেওয়ার শর্তে মিরজাফর কে পুনরায় বাংলার মসনদে বসান।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের আর্থিক দুর্গতির চিত্র রাজনৈতিক অস্থিরতা দ্বারা প্রভাবিত। পলশীর যুদ্ধের পূর্বেই দেশীয় বণিকদের বাণিজ্য কেন্দ্রে ইংরেজ বণিকদের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী সমস্ত জিনিসপত্রের নির্দিষ্ট একটি দাম বেঁধে দিয়েছিলেন। এইসময় সাধারণ মানুষ একটাকায় একমন বত্রিশ সের চাল কিনতে পারত। তবে একজন শ্রমিক সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে দশ পয়সা উপার্জন করত। এরপর ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে অত্যধিক বৃষ্টিপাতের ফলে সমস্ত ধান চাল নষ্ট হয়ে গেলে চরম দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এরফলে বাংলার অর্থনৈতিক কাঠামো এমনভাবে ভেঙে পড়েছিল যে পরবর্তী তিনশত বছরে ও তা আর জোড়া লাগেনি। এই চরম আর্থিক দুর্গতির মধ্যে মানুষের পারিশ্রমিক ছিল যৎসামান্য। যে সমস্ত দেশীয় লোক শ্বেতাঙ্গ ইংরেজ কর্মচারীর বাড়িতে কাজ করত তারা একটু বেশি বেতন পেত। কিন্তু একজন নাপিতের দাড়ি কামাবার পারিশ্রমিক ছিল এক পয়সা। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলায় তন্তুজাত দ্রব্য, লোহা ঢালাই, বন্দুক-কামানোর কারখানা, বরফ তৈরীর কারখানা প্রভৃতি ছিল।

"কিন্তু বর্গীর হাঙ্গামা ও ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানীর স্বার্থপর নীতির ফলে অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালির শিল্প বাণিজ্য, কল-কারখানা সব লোপ পাইয়া গিয়াছিল।" [১২]

পলাশীর যুদ্ধের পর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী, বাণিজ্যভার বাঙালি বণিকদের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে নিজেদের অধিকারে আনে। ফলস্বরূপ অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাঙালি বণিকদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে। এর ফলে সমাজ জীবনে ও অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর অর্থনৈতিক অবস্থা আলোচনা করতে গিয়ে ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রাজনৈতিক ইতিহাস ও পর্যালোচনা করেছেন ——

"অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের রাজনৈতিক ইতিহাস শাঠ্য ষড়যন্ত্র ও নীচতায় পূর্ণ। জীবন ও সাহিত্যে ও সেই উত্তাপ কখনো কখনো সঞ্চারিত হইয়াছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। এই অর্ধ শতাব্দীতে বাঙালির অর্থনৈতিক জীবন শোষণের ফলে বিশীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, বিদেশী বণিক ও মুসলমান সুবাদার, দেওয়ান ও তাহাদের প্রসাদলোভী পরগাছার দল বাংলাকে নিঃসার করিয়া ফেলিয়াছে। আলিবর্দীর আমল হইতে দেশের উপরে যুদ্ধ বিগ্রহের অজস্র বন্যা বহিয়া গিয়াছে, বর্গীরা দেশ লুটিয়া শ্মশান করিয়া দিয়াছে, বাংলা হইতে বহু ধনরত্ন স্বর্ণ রৌপ্য মুদ্রা দিল্লীতে রাজস্ব, নজরানা আবওয়াব প্রভৃতি নানা খাতে প্রেরিত হইয়াছে। বিলাসী উচ্ছৃঙ্খল দুর্নীতি পরায়ণ অভিজাত মুসলমান সমাজের হানিকর ঘৃণ্য আদর্শ জনসাধারণের চরিত্রবল হরণ করিয়াছে। সাহিত্যে ও শুধু পুরাতনের বিশীর্ণ অনুকরণ চলিয়াছে। এই অর্ধ শতাব্দীতে যেন মৃত্যুর অন্ধকার গাঢ়তর হইয়া ঘেরিয়া ধরিয়াছে, আর সেই অন্ধকারে নির্নিমেষ সর্পচক্ষুর মতো ভারতচন্দ্রের আদিরসের ফেন তরঙ্গ জ্বলিতেছে। বিলাসিতা ও বিভ্রান্তি, উজ্জ্বলতা ও বিবর্ণতা, ঐশ্বর্য ও দারিদ্র্য, বিদগ্ধ নাগরিকতাও স্থূল ইতরতা—— সমস্ত পরস্পর বিরোধী ব্যাপার আলো-অন্ধকারের মতো এই অর্ধ শতাব্দীতে বাঙালির মনে শঙ্কা-সংশয়কেই ঘনীভূত করিয়া তুলিতেছিল" [১৩]

এই অর্থনৈতিক দুরাবস্থার মধ্যে সম্রাট দ্বিতীয় শাহ-আলম ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই আগস্ট ইংরেজ কোম্পানীকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ান নিযুক্ত করেন। এরফলে রাজস্ব আদায়ের ভার ও ইংরেজরা পেল। ক্রমে ক্রমে সমস্ত শাসন ক্ষমতা, সামরিক শক্তি, ধন-সম্পদ ইংরেজদের অধিকারে এলে কার্যতঃ নবাবের রাজত্ব শেষ হয়ে ইংরেজ কোম্পানীর রাজত্ব আরম্ভ হল। এইসময় বাংলায় যে শাসন চলছিল তা দ্বৈত-শাসন নামে পরিচিত। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশী যুদ্ধে জয়লাভ করে ক্লাইভ যে ইংরেজ প্রভূত্বের সূচনা করেছিলেন, আট বছর পর ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে তা সুদৃঢ় ভিত্তির উপর ন্যায়সঙ্গতভাবে প্রতিষ্ঠা করেন। তবে বুদ্ধিমান ক্লাইভ সরাসরি নবাবকে সরিয়ে ইংরেজদের প্রতিষ্ঠিত করেন নি। কারণ তিনি বুঝেছিলেন যে, স্বল্পসংখ্যক বিদেশী বণিকদের আধিপত্যে দেশের লোক অসন্তুষ্ট হয়ে উঠে বিদ্রোহ ঘোষণা করবে।। এইসময় ইংরেজ কোম্পানীর কর্মচারীরা অসৎ উপায়ে অর্থোপার্জন এবং নবাবের কাছ থেকে প্রচুর উপঢৌকন গ্রহণ করতে থাকে। ইংরেজ কর্মচারীদের এইসমস্ত দুরাচার সহ্য করতে না পেরে ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ক্লাইভ স্বদেশে ফিরে যান।। ইংরেজ কোম্পানীর একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী রিচার্ড বেচার ২৪ শে মে ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশের প্রজাসাধারণের দুর্দশা সম্বন্ধে বিলাতের কর্তৃপক্ষের কাছে চিঠি লেখেন ——

"কোম্পানীর দেওয়ানিলাভের ফলে প্রজাসাধারণের যেরূপ দুর্দশা হইয়াছে,ইহার পূর্বে কখনো সেরূপ হয় নাই। বহু স্বেচ্ছাচারী নবাবের আমলে ও যে দেশ অতুল সুখ ও সম্পদের অধীকারী ছিল, তাহা ধ্বংসের সীমানায় পৌঁছিয়াছে।'' [১৪]

এই উক্তি যে যথার্থই সত্য বাংলা ১১৭৬ সালে (১৭৬৯-৭০ খ্রীঃ) বাংলাদেশের একভীষণ দুর্ভিক্ষ তার প্রমাণ দেয়।

এই দুর্ভিক্ষে বাংলার মোট অধিবাসীর এক তৃতীয়াংশ লোক অনাহারে ও পীড়ায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে একজন ইংরেজ কর্মচারী এই দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষের দুরবস্থা সম্বন্ধে লিখেছিলেন ——

"বাংলার দুরবস্থা কল্পনা ও বর্ণনার অতীত— এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই যে, বহুস্থানে মৃতের মাংস খাইয়া লোকে জীবনধারণের চেষ্টা করিয়াছে।'' [১৫]

এই চরম দুরবস্থার মধ্যেও দুর্ভিক্ষ পীড়িত লোকদের কাছ থেকে কোম্পানীর কর্মচারীরা জোর জবরদস্তি করে খাজনা আদায় করত। প্রায় তিন দশক পর্যন্ত বাংলায় এই দুর্ভিক্ষের চিহ্ন লোপ পায় নি। এই দুর্ভিক্ষ ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামে পরিচিত।

ব্রিটিশ আধিপত্য বিস্তারের পূর্বে সারাবিশ্বে বাংলা দেশের পরিচিতির কারণ ছিল বাংলার শিল্পপণ্য —— বাংলার মসলিন। আমাদের মনে রাখতে হবে যে পাল, সেন, তুর্কি, পাঠান প্রভৃতি শাসক শ্রেণী দ্বারা বর্হিবিশ্বে বাংলার পরিচিতি ঘটেনি। সাধারণ কারিগর দ্বারা উৎপাদিত পণ্যের দ্বারাই বর্হিবিশ্বে বাংলার পরিচিতি ঘটেছে। ষোড়শ শতকের শেষভাগে নৌপথে বাণিজ্য যাত্রায় বাংলার প্রথম পরিচয় ঘটে পর্তুগালের সাথে। তবে সপ্তদশ শতকে ওলন্দাজরা বাণিজ্যে একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তার করে। সমকালীন বিশ্বে বাংলার তাঁতবস্ত্রের কদর ছিল। অষ্টাদশ শতকের রপ্তানি বাণিজ্যে তাঁতবস্ত্রের ব্যাপক ভূমিকার উল্লেখ পাওয়া যায় ওমপ্রকাশের তথ্য থেকে ——

" আঠারো শতকের প্রারম্ভে ওলন্দাজরা এশিয়া থেকে যে পণ্যসম্ভার হল্যান্ডে রপ্তানি করত, এর শতকরা চল্লিশ ভাগই সংগৃহীত হত বাংলা থেকে। আর ওলন্দাজ কোম্পানি এশিয়া থেকে যে পরিমাণ পণ্য রপ্তানি করত, মূল্যের নিরিখে এর অর্ধেকের বেশি রপ্তানি হত বাংলার বস্ত্র আকারে।।'' [১৬]

ইউরোপীয় বণিকদের আগমনে বাংলাদেশের শিল্প উৎপাদন বেড়েছিল সত্য, কিন্তু মূল্য বাড়ে নি। ইউরোপীয় বণিকদের দাদনি ব্যবস্থা মূল্য বৃদ্ধি ঘটতে দেয়নি। ইউরোপীয় বণিকরা অনেক আগে থেকে দাদন দিয়ে তাঁতিদের মুচলেকাবদ্ধ দাসে পরিণত করত। এরফলে তাঁতিরা আর প্রতিদ্বন্দ্বী অন্যকোনো কোম্পানীর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হতে পারত না। একারণে মূল্যবৃদ্ধি তাঁতি বা তাঁতশিল্পের কোনো উন্নতি ঘটাতে পারেনি।

কোনো দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা নির্ভর করে সেই দেশের যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতির উপরে। নবাবী আমলে সর্বত্রই রাস্তাঘাট ও যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত ছিল। তবে সপ্তদশ শতক থেকে শুরু করে অষ্টাদশ শতকের প্রথমভাগ পর্যন্ত নবাবী আমলে বাংলাদেশ সমৃদ্ধশালী ও ক্রম উন্নতিশীল ছিল। বাংলাদেশের মানুষ কৃষি ও ব্যবসা বাণিজ্যের কাজে স্বাচ্ছন্দবোধ করত। হ্যারি ভেরেলস্ট নামে ইংরেজ কোম্পানীর এক পদস্থ কর্মকর্তার মতে ——

"নবাবী বাংলার সম্পদ শ্রীর কারণ তার শিল্পজাত দ্রব্যের সুলভ মূল্য ও গুণগত উচ্চমান। যার জন্য সর্বত্র এসব জিনিসের প্রচণ্ড চাহিদা ছিল। বড় বড় ইউরোপীয়

জাতির রপ্তানি ছাড়াও বাংলার কাঁচা রেশম, বস্ত্র ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে স্থলপথে দেশের পশ্চিম ও উত্তর প্রান্তে গুজরাট, লাহোর, এমনকি ইস্পাহান পর্যন্ত রপ্তানি হত।।''[১৭]

উর্বরা ভূমি সম্পদ কৃষি ব্যবস্থার উন্নতির সহায়ক। বাংলার কৃষিজাত সম্পদ ছিল অফুরন্ত ও বিচিত্র। সে কারণে বাড়তি কৃষিজাত পণ্য প্রতিবেশী দেশগুলিতে রপ্তানি করা হত। নবাবী আমলে বাংলাদেশে সুতিবস্ত্র ও রেশম উৎপাদন চরম উন্নতি লাভ করেছিল। নবাবী আমলে বাংলা প্রতিবছর আটচল্লিশ লক্ষ টাকা মূল্যের কাঁচা রেশম বিদেশে রপ্তানি করত।

তবে একথা অনস্বীকার্য যে, নবাবী আমলে রাজনৈতিক সুস্থিরতা ছিল বলেই অর্থনৈতিক অবস্থার এরকম উন্নতি সম্ভব হয়েছিল। মুর্শিদকুলি খান যে নবাবী শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, পরবর্তীকালে সুজাউদ্দিন খান ও আলিবর্দী খানের মতো সুদক্ষ শাসকের পরিচালনায় তা প্রায় পঞ্চাশ বছর স্থায়িত্ব লাভ করেছিল। নবাবী আমলের অর্থনৈতিক অবস্থা যে পরবর্তী কোম্পানীর আমলের অর্থনৈতিক অবস্থার তুলনায় উন্নত ছিল, কোম্পানীর অন্যতম কর্মকর্তা রিচার্ড বেচার তা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন ——

"একজন ইংরেজের পক্ষে বিশ্বাস করতে অবশ্যই কষ্ট হয় যে,কোম্পানী দীউয়ানি ক্ষমতা অধিগ্রহণের পরে এদেশের লোকের অর্থনৈতিক অবস্থা আগের চেয়ে খারাপ হয়েছে, কিন্তু একথা অস্বীকার করা যায় না।'' [১৮]

পলাশীর যুদ্ধের পরবর্তী সময়ে তথাকথিত ভারতীয় সংস্কৃতি ধীরে ধীরে লোপ পেতে শুরু করে। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সঙ্গে সমন্বয়ের ফলে বাংলার সংস্কৃতি হিন্দু নয়, মুসলমান ও নয় — এক স্বতন্ত্র আন্তর্জাতিক সংস্কৃতির রূপ পরিগ্রহ করে। এইসময় ধোপা, নাপিত, ছুতার, মেথর প্রভৃতি নীচ জাতীয় লোকেরা লেখাপড়া শিখে সামাজিক মর্যাদালাভ করতে সচেষ্ট হয়। এরফলে জাতিভেদের কঠোরতা তুলনামূলক ভাবে শিথিল হয়ে এলো। পরবর্তী সময়ে সমাজে ধীরে ধীরে অসবর্ণ বিবাহ চালু হতে শুরু করে। আর একারণেই 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র বিভিন্ন পালাগুলিতে সমাজের জাতিভেদ প্রথার গণ্ডি অতিক্রম করে অসবর্ণ বিবাহের পরিচয় মেলে। দ্বাদশ শতাব্দী থেকে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত শস্য, সম্পদ, শিল্প ও বাণিজ্যের কারণে বাংলাদেশ ধনসম্পদে বিশেষ সমৃদ্ধ ছিল। এরপর সপ্তদশ শতকে দেশে মোঘল শাসনকালে উৎকৃষ্ট শাসন ব্যবস্থার ফলে শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষির উন্নতি হয়েছিল ঠিকই কিন্তু বাৎসরিক রাজস্ব হিসাবে বহু টাকা দিল্লীতে যাওয়ার কারণে এবং অবসর গ্রহণ কালে সুবাদার ও কর্মচারীগণের অসদুপায়ে বহু অর্থ আত্মসাৎ এর কারণে অর্থনৈতিক ভিত সুদৃঢ় হতে পারেনি। তবে বাংলাদেশ বস্ত্র শিল্পে উন্নত থাকার কারণে বহুলোক এরদ্বারা জীবিকা অর্জন করত। বাংলার জগৎ বিখ্যাত মসলিন বস্ত্রশিল্পের প্রধান কেন্দ্র ছিল ঢাকা। ইরাক, আরব, ব্রহ্মদেশ, মালাক্কা, সুমাত্রা এমনকি ইউরোপে ও এই বস্ত্র রপ্তানি করা হত। অতি সূক্ষ্ম মসলিন বস্ত্র থেকে আরম্ভ করে গরীবদের জন্য মোটা কাপড় সমস্তই ঢাকায় তৈরী হত। ঢাকার দুটি বিখ্যাত শিল্প নৌকা নির্মাণ ও শঙ্খ প্রস্তুত করার কাজ করে বহুলোক জীবিকা নির্বাহ করত। প্রসঙ্গতঃ ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে বাংলাদেশ থেকে প্রতিবছর ৫০,০০০ মন চিনি বিদেশে রপ্তানি করা হত। আরো জানা যায় যে অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ পর্যন্ত চট্টগ্রামে সমুদ্রগামী নৌবহর তৈরী হত। ব্যবসা বাণিজ্যকে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করে চট্টগ্রাম, ঢাকা সহ বাংলাদেশের বহুমানুষ ঐশ্বর্যশালী হয়ে উঠেছিল। তবে বাংলাদেশে ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তির পাশাপাশি দরিদ্র ব্যক্তি কম ছিল না। দ্রব্যাদির মূল্য সস্তা হলেও রাজকর্মচারীদের অত্যাচার ও উৎপীড়নে সাধারণ কৃষক ও প্রজাগণের দুঃখ-দুর্দশার অন্ত ছিল না।

ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক কারণে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দিক থেকে ময়মনসিংহ অঞ্চল গুরুত্বপূর্ণ হয়ে

উঠেছিল। মেঘনা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি নদী ময়মনসিংহ অঞ্চলের উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার ফলে একদিকে নদী উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলি উর্বর কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে, অন্যদিকে অঞ্চলটি ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ময়মনসিংহ অঞ্চলের শস্যশ্যামলা কৃষিভূমি এখানকার অর্থনীতির মেরুদণ্ড ছিল। ঔপনিবেশিক ইংরেজ শাসনকালে ময়মনসিংহ অঞ্চল দ্রুত ক্রমোন্নতি লাভ করেছিল। ময়মনসিংহ অঞ্চলের নদী তীরবর্তী বালুকাময় জমিতে পাটও নীলচাষ ভালো হত। আটিয়া, কাগমারী, জফরসাহী প্রভৃতি স্থানে উৎকৃষ্ট ফসল হত। এই জেলায় জমি কৃষি উপযোগী হলেও মুসলমান শাসনকালে ভূমিতে চাষীদের সত্ত্ব না থাকায় কৃষির বিশেষ উন্নতি ঘটেনি। তবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর কৃষিতে উন্নতির জোয়ার আসে। এই জেলার প্রধান কৃষিজাত শস্য ধান। আউস, আমন, বোরো—তিন রকমের ধান চাষ হত এই জেলায়। ময়মনসিংহ জেলার জামালপুরে তুলা চাষ, সুসঙ্গে চা চাষ, জফরসাহীতে পাট চাষ, পুখুরিয়া অঞ্চলে তামাক চাষ, হুসেনশাহী পরগণায় ইক্ষু চাষ, হাজবাদী অঞ্চলে সুপারি ও পান চাষ ও কাগমারী পরগণায় আম চাষ হত। কৃষিকার্যের উন্নতির জন্য গৌরীপুর ও জামালপুরে দুটি ফার্ম ছিল। এছাড়া কৃষিজাত দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য বাণিজ্য উপযোগী বাজারও ছিল। জামালপুর, নেত্রকোণা, কিশোরগঞ্জ প্রভৃতি স্থানের হাটবাজারগুলি থেকে প্রতিবছর প্রচুর পরিমাণে ধান, পাট বিদেশে রপ্তানি করে ময়মনসিংহ জেলা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি লাভ করত। সুপ্রাচীন কাল থেকে ময়মনসিংহের প্রধান শিল্প ছিল বস্ত্রশিল্প। বাজিতপুরের মসলিন, কিশোরগঞ্জের তাঞ্জাব চাদর দিল্লীর বাদশাহদিগের চিত্তহরণ করত। ওলন্দাজগণ কিশোরগঞ্জ ও বাজিতপুরে কুঠী নির্মান করে মসলিনের ব্যবসা করত। টাঙ্গাইল মহাকুমার পাথরাইল এবং ছোট বৈন্যাফৈর গ্রামের তন্তুবায়গণ উৎকৃষ্ট রেশমীবস্ত্র প্রস্তুত করত। গীতিকাগুলির ভিত্তিভূমি যে ময়মনসিংহ অঞ্চল সেখানকার অর্থনৈতিক ভিত যে সুদৃঢ় ছিল উপরোক্ত আলোচনায় তা উপলব্ধ হয়।

ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক মহাশয় সুদীর্ঘকাল ধরে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে পালার গায়ক, বয়াতি ও গায়েনদের কাছ থেকে যে পালাগুলি সংগ্রহ করেছিলেন সেগুলি 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা' নামে সাত খণ্ডে প্রকাশ করেন। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মৌলিক মহাশয় মূলতঃ মৈমনসিংহ, ঢাকা, ফরিদপুর নোয়াখালি, চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরা— এই ৬টি জেলা থেকে পালাগুলি সংগ্রহ করার সময় উপলব্ধি করেছিলেন, পূর্ববঙ্গের চিত্ত-চাঞ্চল্যকর সত্য ঘটনামূলক পালাগুলি ঘটনার অব্যবহিত পরেই রচিত হয়েছিল। পালার ঘটনার সত্যতা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে শ্রদ্ধেয় মৌলিক মহাশয় মন্তব্য করেছেন —

> *"পালা রচনা করিয়া জনসাধারণের সম্মুখে গাইতে গেলে উপস্থিত*
> *শ্রোতাদের মধ্যে কেহ কেহ ঘটনার সঙ্গে সংশিষ্ট ও প্রত্যক্ষদর্শী থাকা সম্ভব।*
> *সেজন্য এইসব পালায় বর্ণিত মূল কাহিনী এবং তৎকালের দেশ ও সমাজচিত্র*
> *গুলি অকৃত্রিম ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া আমরা গ্রহণ করিতে পারি।"*[১৯]

ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক মহাশয় মনে করেন 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র অধিকাংশ পালার রচনাকাল খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী থেকে খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়। পালাগুলির মধ্যে যে প্রচুর ঐতিহাসিক উপাদান আছে, সেসব বিষয়ে দীনেশচন্দ্র সেন ও ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক সহমত পোষণ করেছেন। 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র পালাগুলি পর্যালোচনা করলে সেযুগের আর্থসামাজিক অবস্থা সম্পর্কে আমরা অবহিত হতে পারবো।

'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত 'বাইদ্যা কন্যা মহুয়া' পালায় বেদের দলের সর্দার হুমরা বেদে তার দলবল নিয়ে নানাস্থানে খেলা দেখিয়ে অর্থোপার্জন করে জীবন জীবিকা নির্বাহ করত। এইসময় সমাজে জাতিভেদ প্রথার প্রচলন ছিল। সেকারণে ব্রাহ্মণ সন্তান নদ্যারচাঁদের সঙ্গে শূদ্র কন্যা মহুয়ার বিবাহ সমাজ অনুমোদন করেনি। ফলস্বরূপ নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে এইসম্পর্ক শেষ পর্যন্ত মৃত্যুকে বরণ করে

নিতে বাধ্য হয়েছে। আবার 'সুন্দরী মলুয়া' পালার ঘটনা ঘটেছিল সম্রাট আকবরের রাজত্ব কালে। আকবরের রাজত্বকাল ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দ। এই সময়ের আর্থিক অবস্থা, সামাজিক অধিকার, দেশের বিচার পদ্ধতি সর্বোপরি নাগরিক অধিকার কেমন ছিল — এই সমস্ত একাধিক তথ্য আমরা 'সুন্দরী মলুয়া' পালা থেকে জানতে পারি। এইসময় বাঙালি হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণ সমস্বার্থে পরস্পরের সহায়ক ছিল। 'সুন্দরী মলুয়া পালা' থেকে জানতে পারি যে, এইসময় অনেক জনসাধারণ কুড়া নামক পাখি শিকার করে এবং সুতো কেটে জীবন জীবিকা নির্বাহ করত। আবার 'কেনা ডাকাতের পালা'য় হালুয়ার সাত পুত্র ডাকাতি করে জীবন ধারণ করত। তৎকালীন সমাজ ও শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক মহাশয় 'কেনা ডাকাতের পালা'র ভূমিকায় বলেছেন ——

"এই পালায় তৎকালের শাসন কর্তৃপক্ষ, প্রজাপালনের স্বরূপ ও দুর্ভিক্ষের যে বর্ণনা আছে তাহা ঐতিহাসিক সত্য অনুসন্ধিৎসু গণের সম্মুখে তৎকালের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করিবে।।"[২০]

প্রথম খণ্ডের 'আয়না বিবির পালায়' বাণিজ্য যাত্রার উল্লেখ আছে। এই পালায় মামুদ উজ্জ্যাল বাণিজ্য যাত্রায় বেরিয়ে গারুয়া বা গারো জাতির গ্রামে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। এইসময়কার সমাজে করুঞ্জিয়া ও গারুয়া জাতির মানুষ বাস করত। কুরুঞ্জিয়া জাতির পুরুষরা গৃহস্থালির কাজ করত এবং মহিলারা গ্রামে গ্রামে পণ্য ফেরি করে জীবন জীবিকা নির্বাহ করত। আলোচ্য পালায় তার পরিচয় মেলে ——

"পুরুষলোকে রান্ধে বাড়ে নারীয়ে বইস্যা খায়।
ঘরের নারী তারা গাঁওয়ালে বেড়ায়।।"[২১]

'শ্যামরায়ের পালা'টি প্রাক্-মুসলিম যুগের রচনা বলে মনে হয়। কারণ পালার ঘটনাকালে হিন্দুজমিদার বা রাজারা নিজস্ব সৈন্য নিয়ে রাজ্য আক্রমণ করতে পারতেন। আবার 'শ্যামরায়ের পালা'য় গাবর বা গাবুর জাতিসম্পর্কে আমরা নানা তথ্য জানতে পারি। গাবরদের বাসস্থান পূর্ববঙ্গের দক্ষিণের পার্বত্য অঞ্চল। এইসময় রাজারা এত স্বেচ্ছাচারী ও স্বৈরাচারী ছিলেন যে, কোনো সুন্দরী নারী চোখে পড়লে তাকে ধরে নিয়ে জোরপূর্বক বিবাহ করতেন। এই পালায় তার পরিচয় মেলে——

"রাজার পছন্দ যারে সেই পড়ে ফেরে।
দেখিলে সুন্দরী নারী আইন্যা বিয়া করে।" [২২]

গাবর সমাজে পুরুষরা একাধিক বিবাহ করতে পারত। এইসময় সমাজের নিম্ন সম্প্রদায় ডোম নারীরা খাড়ি অর্থাৎ মাছ ধরার যন্ত্র, বিউনি অর্থাৎ বাতাস করবার পাখা এবং খাউড়ি অর্থাৎ বাঁশ নির্মিত শস্যাধার বানিয়ে বাজারে বিক্রয় করে জীবন-জীবিকা নির্বাহ করত।

'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত ''কাঞ্চন কন্যা (ধোপার পাট)'' পালায় তমসা গাজীর ব্যবসা বাণিজ্য করে জীবিকা নির্বাহের কথা আমরা জানতে পারি। তমসা গাজী পাঁচ খানা ডিঙা ভর্তি করে ধান নিয়ে বাণিজ্য যাত্রা করে। ধোপা ও মালি বৃত্তি অবলম্বন করেও অনেকে জীবনধারণ করত। 'কমলা রানীর পালা'য় কোচ্ জাতির লোকদের বিবরণ পাওয়া যায়। কোচ্রা পাহাড়ের উপরে মন্দির নির্মান করে সেখানে কামাক্ষী দেবীর পূজা করত। এই মন্দিরে প্রতিদিন পাঁঠা বলি হত, শনি-মঙ্গল বারে মহিষ বলি হত। এবং অমাবস্যা তিথিতে নরবলি হত। 'রাজকন্যা রূপবতী' পলায় দুশমনের ভয়হীন জালুয়া জাতির জোটবদ্ধ লড়াই এর কথা আছে। এই সমাজে মাছ ধরে জীবন ধারণের পরিচয় মেলে। এই পালায় কাঙ্গালিয়া ও জাঙ্গালিয়া দুই ভাই জালবেয়ে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করত। আবার 'পীরবাতাসী কন্যা' পালায় বাণিজ্য যাত্রার কথা আছে।

এই পালায় আমরা চান্দ বেপারিকে বিদেশে বাণিজ্য করতে যেতে দেখি। প্রথম খণ্ডের 'শ্যামরায়ের পালা' র মতো দ্বিতীয় খণ্ডের এই পালায় আমরা গাবর জাতির পরিচয় পাই। তাছাড়া এই পালায় ওঝা সম্প্রদায়ের মানুষের কথা ও আছে। ওঝা সম্প্রদায় বিপদ্ সঙ্কুল অরণ্য পরিবেশে মানুষদের কে বিষধর সাপের হাত থেকে রক্ষা করে। এই পালায় কংস নদীর তীরে সুমাই ওঝার বসতির কথা আছে। 'সদাগর কন্যা বগুলা (বগুলার বারমাসী)' পালায় জীবন-জীবিকা হিসাবে বিদেশে বাণিজ্য যাত্রার কথা আছে। আবার মনসুর বয়াতি রচিত 'দেওয়ান মদিনার পালায় (আলাল দুলালের পালায়)' কৃষিকাজ করে জীবন ধারণের কথা আছে। আবার 'আমিনা বিবি ও নছর মালুম' পালায়, প্রথম খণ্ডের 'আয়না বিবির পালায় বর্ণিত করুঞ্জিয়া সম্প্রদায়ের লোকের জীবন জীবিকা নির্বাহের কথা আছে। এইসময় মানুষ নানারকম কাজ করে জীবন ধারণ করত। কেউ শুকনো মাছ বিক্রি করে, কেউ বা কৃষিকাজ করে জীবন ধারণ করত।

'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র তৃতীয় খণ্ডে প্রকাশিত 'লীলাকন্যা কবি কঙ্ক' পালার রচয়িতাগণ খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতকের শেষভাগে জীবিত ছিলেন বলে দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় মনে করেন। অর্থনৈতিক দুরবস্থার কারণে মানুষ ভিক্ষা করে কোনোরকমে জীবনধারণ করত। আবার দরিদ্র শ্রেণীর পাশাপাশি সমাজের উচ্চবিত্ত শ্রেণীর মানুষজন নদীপথে ব্যবসা-বাণিজ্য করে ও অভিজাত জীবনযাপন করত। দ্বিতীয় খণ্ডের 'কমলা রাণীর পালা'র মতো এ পালাতে ও দেবতার পূজায় বলি প্রথার প্রচলন আছে। ধর্মীয় জীবনে হিন্দু-মুসলমান সকলেই সত্যপীরের পাঁচালীর সমাদর করতেন। ব্রাহ্মণ চণ্ডাল সকলেই হরিনামে মত্ত হয়ে সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ ভুলে যেতেন। 'ভেলুয়া সুন্দরী ও আমির সাধুর পালা'য় বাণিজ্য যাত্রা ও শিকার করে অনেকে জীবিকা নির্বাহ করত। 'কমলা কন্যা পালা'য় কমলা কর্তৃক কারকুনকে শূলে চড়ানো বা দয়াল রাজা কর্তৃক সপুত্র মানিক চাকলাদারকে বলি দেওয়ার ঘটনা দেখে মনে হয় পালাটি প্রাকমুসলিম যুগের ঘটনা অবলম্বনে লেখা। এই পালায় গোয়ালা গোয়ালিনীরা ক্ষীর, সর বিক্রি করে এবং পালকি বাহকের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করত। আবার 'কাফেন চোরা (আয়না বিবির পালা)' পালাটি খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর রচনা বলে মনে হয়। কারণ ঐ সময়ে ঐ অঞ্চলে কোনো শক্তিশালী রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা না থাকায় মঘ দস্যুদের অত্যাচারে শান্তিপ্রিয় হিন্দুজাতি উৎখাত হয়ে গিয়েছিল। পালা পর্যালোচনা করে জানা যায়, এই পালায় আরাকানী, মাংঠিফ, মখ, জুমিয়া, চাকমা প্রভৃতি জাতি ও ওঝা সম্প্রদায়ের মানুষ পাহাড়ের বনাঞ্চল থেকে বাঁশ, বেত, ছন প্রভৃতি সংগ্রহ করে তা বিক্রি করে জীবনধারণ করত। এই খণ্ডের 'শীলাদেবীর পালা'র সমসাময়িক সমাজে জাঙ্গালিয়া জাতি বাস করত। এই দুধর্ষ জাতি কৃষিকাজ না করে ডাকাতি করে জীবনধারণ করত। আবার 'সুনাইসুন্দরী বা দেওয়ান ভাবনা' পালার ঘটনার সমসাময়িক কালে সমাজে ব্রাহ্মণ শ্রেণীর মানুষ যজমানি করে জীবন জীবিকা নির্বাহ করত। 'ভারইয়া রাজকন্যা চম্পাবতী পালাটির ঘটনায় তান্ত্রিক প্রভাব দেখে মনে হয় পালাটির ঘটনাকাল সম্ভবতঃ দশম বা একাদশ শতকের মধ্যবর্তী সময়। পালাটির ঘটনার সমসাময়িক কালে কোচ এবং হাজংজাতি কৃষিকাজ করে জীবনধারণ করত।

'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র চতুর্থ খণ্ডে প্রকাশিত 'রঙ্গমালা সুন্দরী-চৌধুরীর লড়াই' পালাটি ঐতিহাসিক দিক থেকে বিশেষ মূল্যবান। এই পালার ঘটনার সময় পূর্ববঙ্গে চরম দুর্দিন নেমে এসেছিল। এইসময় নর নামে একটি জাতি গান-বাজনাকে পাথেয় করে বেঁচে ছিল। শ্রদ্ধেয় দীনেশ চন্দ্র সেনের মতে পালাটি ——

> *"বাংলাদেশের কোনো এক বিশেষ যুগের নিখুঁত একখানি চিত্র হিসাবে মূল্যবান। ইহাই অষ্টাদশ শতাব্দীর ব্যঙ্গ চিত্র-সত্যের প্রতিবিম্ব অষ্টাদশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশ রাজনৈতিক দুর্দিনের চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছিল। মোগল শাসন শিথিল হইয়া পড়িলে দেশে যে দুর্দিন উপস্থিত হইয়াছিল*

তাহা অকথ্য, এই পালাগানের পত্রে পত্রে তাহা উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত হইয়াছে।'' [২৩]

এই খণ্ডের 'ভরার মেয়ের গান' পালাটি থেকে জানা যায় সমসাময়িককালে সমাজে ঘটক বৃত্তি করে অনেকে অর্থোপার্জন করত। আবার 'মানিকতারা ডাকাইতের পালা'য় জেলে ও নাপিত বৃত্তি গ্রহণ করে অনেকে জীবনধারণ করত। পালায় ডাকাতি করে জীবনধারণের পাশাপাশি অনেকে কবিরাজী করেও জীবিকা নির্বাহ করত। ' নেজাম ডাকাইত পীরের কেরামতি' পালার ঘটনা থেকে আমরা জানতে পারি জংলিজাতি গাবর, যারা বাঘ, সিংহকে পর্যন্ত ভয় করত না তারাও নেজাম ডাকাতের ভয়ে কাঁপত। এই খণ্ডের 'মৈষাল বন্ধু সাঁজুতি কন্যার পালা'টি পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে পালা রচনার সমসাময়িক কালে মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত দুর্বিষহ ছিল। পালায় বাণিজ্য যাত্রার কথা ও আছে। 'শান্তিকন্যার হাঁহলা' পালাটি প্রাক্ মুসলিম যুগের রচনা বলে মনে হয়। পালায় সুন্দর সদাগরের পুত্র গুণধরের বাণিজ্য যাত্রার কথা আছে।

'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র পঞ্চম খণ্ডের 'কমল সদাইগরের পালায়' মানুষ গ্রামে গ্রামে পণ্য ফিরি করে, বাড়িতে বাড়িতে ঘুরে মাছ বিক্রি করে, আমদানি করা বাঁশ বিক্রি করে জীবন জীবিকা নির্বাহ করত। 'আন্ধাবন্ধুর বাঁশি' পালাটির রচনাকাল আনুমানিক চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগ কিংবা পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাগ। 'পরীবাণু বেগমে'র পালা'টির রচনার সমসাময়িক কালে মঘও পর্তুগীজ জলদস্যুদের আধিপত্য ছিল। পালায় চট্টগ্রামের আরাকান অঞ্চলের রোসাঙ্গা জাতি এবং পার্বত্য অঞ্চলের মুরঙ্গ্যা জাতির উল্লেখ আছে। 'ছুরত জামাল-অধুয়া সুন্দরী' পালায় স্বেচ্ছাচারী শাসকদের হাতে দেশ-জন-জাতি কতটা নিঃসহায় ছিল, তা পালায় উল্লিখিত নিষ্ঠুর শাস্তি প্রদান থেকে এবং অধিবাসীদের হত্যার আদেশ থেকে অনুমান করা যায়। এইসময় বঙ্গদেশে হিন্দু-মুসলমান - উভয় সম্প্রদায় মূলতঃ ছিল একই জাতি। সেজন্য বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন ধর্মে ধর্মান্তরিত হলেও তাদের মধ্যে একই প্রকার রুচি ও সংস্কার থেকেই যেত। আর এই কারণে বিভিন্ন পালায় হিন্দু কন্যাদের প্রতি মুসলমানদের আসক্তি অনেকটা অবসম্ভাবী ছিল। আর এই একই কারণে আলোচ্য পালায় হিন্দু রাজকন্যা অধুয়া সুন্দরীর প্রতি মুসলমান দেওয়ান জামাল খাঁর আকর্ষণ অনেকটা স্বাভাবিক ছিল। দেওয়ানদের মধ্যে অনেকেই পূর্বে হিন্দু ছিলেন। পরবর্তীকালে ইসলাম ধর্মগ্রহণ করলেও তাদের অন্তরে হিন্দুধর্মের প্রতি অনুরাগ থেকেই যেত। তৎকালীন হিন্দুসমাজ এদেরকে অস্পৃশ্য জ্ঞানে বর্জন করত। এরা যখন ক্ষমতাশালী দেওয়ান, বণিক, চাকলাদার, উজির প্রভৃতি পেশায় নিযুক্ত হতেন, তখন হিন্দু সমাজের অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য হিন্দু কন্যাদের জোরপূর্বক অপহরণ বা বিবাহ করতেন। 'কবরের কান্না' পালাটি পূর্ববঙ্গের মাঝিমাল্লা ও ধীবরদের কাছে অত্যন্ত প্রিয় ছিল। পালাটির ঘটনার সমসামায়িক কালে সমাজে, জেলে, ক্ষেত্যাল, তাঁতি, ধোপা, নাপিত, কামার প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মানুষ বাস করতেন। প্রত্যেক সম্প্রদায় তাদের নিজ নিজ কাজ করে জীবন ধারন করত। পালার বর্ণনায় নদীপথে বাণিজ্যের কথা যেমন আছে, তেমনি বাণিজ্য বহরের উপর হার্মাদ নামক জলদস্যুদের অতর্কিত আক্রমণের কথাও আছে।

'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র ষষ্ঠ খণ্ডের অন্তর্গত 'কুমার বীর নারায়ণের পালা'টি প্রাক্ মুসলিম যুগের রচনা। কারণ মুসলিম শাসনকালে কোনো হিন্দু জমিদার অপরাধীর বিচার করে দণ্ড দিতে পারত না। পালাটির ঘটনা বর্ণনায় সমকালীন সামাজিক, রাজনৈতিক ও জনসাধারণের রাষ্ট্রিক অধিকার সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আছে। ঘটনা বর্ণনায় সমসাময়িক কালে বণিক সদাগররা বিদেশে বাণিজ্য করতে যেত। 'ভেলুয়া সুন্দরী মদন সাধুর পালা'য় বণিক সদাগরদের বহির্বাণিজ্যের প্রসঙ্গ দেখে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় যে, পালার ঘটনাকাল খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী। কারণ স্বরূপ বলা যায় খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম দশকে আলাউদ্দিন খলজি শাসনব্যবস্থায় যে অর্থনীতি প্রবর্তন করেছিলেন, তাতে ভারতীয় বণিকদের বহির্বাণিজ্য ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

ভেলুয়া সুন্দরী ও মদন সাধুর বিবাহ ব্যাপারে গণক ডেকে পঞ্জিকা দেখে বিবাহের দিনক্ষণ স্থির করার প্রসঙ্গ দেখে অনুমান করা যায় যে সমকালীন সমাজব্যবস্থায় পঞ্জিকা ও গণকঠাকুরের সমাদর ছিল। পালার ঘটনার সমকালীন সমাজে নাপিত, ঘটক, পুরোহিত বৃত্তি গ্রহণ করে অনেকে জীবিকা নির্বাহ করত। ডোম নারীরা খারি (ফুল তুলবার সাজি), বিউনি (হাতপাখা) বিক্রি করে জীবনধারণ করত। 'বাইন্যা বউ লক্ষ্মীর ঝাঁপি' পালাটির ঘটনার সমসাময়িক কালে মানুষ ধর্মের প্রতি অনুরাগ বশতঃ গুরুপূজা, কুমারী পুজা সহ বিভিন্ন পূজা অর্চনা করত। 'মলয়া কন্যা পালা'টির সমসাময়িক কালে বণিক সদাগর গণ বৈদেশিক বাণিজ্যে যেত এবং মঘ ও পর্তুগীজ জলদস্যুদের দ্বারা আক্রান্ত হত। 'হাতি খেদার গান' পালাটির ঘটনার সমসাময়িক কালে কুকি, মুরুং, জুমিয়া, চাকমা প্রভৃতি পার্বত্যজাতিরা চাষবাস করে জীবনধারণ করত। আরাকান অঞ্চলের মঘ দস্যুরা ডাকাতির মতো হীন কাজ করে বেঁচে থাকত। এছাড়া অভাবের তাড়নায় মানুষ পার্বত্য বনাঞ্চল থেকে বাঁশ-ছন-বেত কেটে এনে বিক্রি করে জীবন ধারণ করত।

'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র সপ্তম খণ্ডের অন্তর্গত 'রতন ঠাকুরের পালা'টি ময়মনসিংহ, ঢাকা, নোয়াখালি ও ত্রিপুরা জেলার নৌকার মাঝি মাল্লাদের মধ্যে বেশ জনপ্রিয় ছিল। 'হরিণকুমার জিরালনী কন্যার পালা'টি আর্থসামাজিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। পালার ঘটনার সমসাময়িক কালে কাঠুরিয়া ও জেলে বৃত্তি গ্রহণ করে বহু মানুষ জীবন ধারণ করত। জেলেরা মাছ ধরতে গিয়ে ঝিনুক কুড়িয়ে তার মধ্য থেকে মুক্তা সংগ্রহ করে বিক্রি করে অর্থোপার্জন করত। 'সন্নমালার পালা'র সামাজিক ও ঐতিহাসিক মূল্যকে অস্বীকার করা যায় না। পালাটির রচনাকালে উচ্চবর্ণের পাত্রীর সঙ্গে নিম্নবর্ণের পাত্রের বিবাহে বাধা ছিল না। প্রাপ্তবয়স্কা পাত্রী নিজের পছন্দ মতো পাত্র নির্বাচন করতে পারত। সমাজে বহুবিবাহের প্রচলন ছিল। সদাগররা বাণিজ্য যাত্রায় যেতেন কিন্তু পর্তুগীজ ও মঘ জলদস্যুদের ভয়ে রাতে ডিঙা নিয়ে চলাচল করতেন না। মাননীয় দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর সম্পাদিত 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র চতুর্থ খণ্ডে এই একই পালার ভূমিকা অংশে লিখেছেন——

> *"আমাদের পালাগানগুলির ভিতরে সমাজ, রাজনীতি, ভাষাতত্ত্ব ও কবিত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে নানা দিক দিয়াই অনেক মূল্যবান উপাদান পাওয়া যায়।"*[২৪]

অবশেষে বলা যায় যে, ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক সম্পাদিত 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র পালাগুলি মৌলিক এবং বঙ্গপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য জ্ঞাপক। গীতিকাগুলির রচয়িতাদের অনেকেই নিরক্ষর কিন্তু এদের সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে স্বীয় সমাজ ও দেশের যে চিত্র ধরা পড়েছে তা একেবারে নিখুঁত। এইসমস্ত প্রাচীন পল্লী কবিদের সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব জ্ঞান ও পুঙ্খানুপুঙ্খ মানসিক ভাবের বিশ্লেষণ ক্ষমতা, এদেরকে বৈষ্ণব কবিদের সমকক্ষ করে তুলেছে। হিন্দু-মুসলমান একত্রে যে পল্লীগাথা রচনা করেছে ব্রাহ্মণরা তা পছন্দ করত না। একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যেসমস্ত স্থান নব ব্রাহ্মণ্যের গণ্ডীর বাইরে ছিল, সেখানকার জনগণ এই প্রাচীন পল্লীগাথা রূপ সম্পদকে আঁকড়ে ধরে রেখেছিল। সেইকারণে ব্রাহ্মণ্যের বাইরে অবস্থিত পূর্ব ময়মনসিংহ অঞ্চলে বেশিরভাগ পল্লীগীতিকা পাওয়া গেছে। গীতিকা-গুলিতে প্রাপ্ত বয়স্কা কুমারীগণের স্বেচ্ছা স্বামীগ্রহণের কথা, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে নির্বিচার বিবাহ প্রথার কথা ছিল বলে তখনকার দিনের উচ্চশ্রেণীর হিন্দু বাড়িতে এইসমস্ত পালাগাইতে দেওয়া হত না। হিন্দুদের যে ব্রাহ্মণ্য অনুশাসন, মুসলমানদের তা না থাকায় প্রাচীন পল্লী গীতিকাগুলি হিন্দুগৃহ থেকে বিতাড়িত হয়ে মুসলমানদের মধ্যে বেঁচে ছিল। গীতিকাগুলির রচয়িতাগণ হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের হলেও পালাগুলির অধিকাংশ গায়েনই ছিলেন মুসলমান। 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র সম্পাদক শ্রদ্ধেয় ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক মহাশয় তাঁর তৃতীয় খণ্ডে প্রকাশিত 'সুনাই সুন্দরী পালা'র ভূমিকা অংশে বলেছেন ——

"খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধ পর্যন্ত প্রায় চারিশত বৎসর বাঙ্গলাদেশে পল্লীজীবন এবং জনসাধারণের আর্থিক ও রাজনৈতিক অবস্থার প্রকৃত চিত্র এই পল্লী গীতিকাগুলিতে আছে।"[২৫]

তথ্যসূত্র ঃ—

১. *R.C. Dutta - A History of Civilization in Ancient India, Page No. 501*

২. কেদার নাথ মজুমদার - ময়মনসিংহের ইতিহাস - পৃষ্ঠা নং - ৫

৩. *B. Hamilton's Hindusthan, Vol-1, Page No - 114*

৪. বরুণ কুমার চক্রবর্তী - গীতিকা ঃ স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য, দ্বিতীয় পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ, ডিসেম্বর-২০০৩, পুস্তকবিপণি, কলি - ৯, পৃষ্ঠা নং - ৮০

৫. খগেশ কিরণ তালুকদার - ময়মনসিংহের জনসমাজ, সংগ্রহীত- ময়মনসিংহ ঃ ইতিহাস-সমাজ-সংস্কৃতি-বীরেন চন্দ্র সম্পাদিত, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং - ২০১

৬. শরিফ আহমেদ - বাংলার সমাজে, সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে মুসলিম অবদান, রায় অনুরুদ্ধ ও চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদিত, কে.পি.বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, কলিকাতা - ১৯৯২, পৃষ্ঠা নং - ২০৮

৭. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় - বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (তৃতীয় খণ্ড) ঃ দ্বিতীয় পর্ব, মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা - ৭৩, পুনর্মুদ্রণ ২০১১ - ১২, পৃষ্ঠা নং - ২৮

৮. *A Karim, Murshid Quil Khan, Page No - 85*

৯. *Ghulam Hussain Salim, Riyaz-us-Salatin, Ed by Abdus Salam, Calcutta - 1904, Page No - 228*

১০. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় - বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (৩য় খণ্ড) ঃ দ্বিতীয় পব, মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-৭৩, পুনর্মুদ্রণ - ২০১১-১২, পৃষ্ঠা নং - ২৮

১১. *Hills Bengal in 1556-1557, Vol -III, Page No - 328*

১২. *Dr. K.K Dutta - Studies in the History of Bengal Subah, Vol -1, Page No - 33*

১৩. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় - বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (৩য় খণ্ড) ঃ দ্বিতীয়পর্ব, মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলি - ৭৩, পুনর্মুদ্রণ - ২০১১-১২, পৃষ্ঠা নং - ২৭

১৪. *Richard Becher's Letter to Government Verelst, 24 May 1769 Quoted in W.k Firmenger Historical Introduction to the Bengal Portion of the Fifth report, reprint (Calcutta - 1962), Page No - 183*

১৫. রমেশ চন্দ্র মজুমদার - বাংলাদেশের ইতিহাস (৩য় খণ্ড), তৃতীয় সংস্করণ শ্রাবণ -১৩৮৮, জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলি - ১৩, পৃষ্ঠা নং - ৪

১৬. *Dutch East India Company - Om Prakash, Page No - 8*

১৭. *Verelst to court of Directors 5th April 1789, Bengal Public Consultations (B.P.C), Vol - 44f, Para - 6,Page No - 324*

১৮. *Richard Becher's Letter to Governor Verelst, 24 May 1769 Quoted in W.K Firmenger Historical Introduction to the Bengal Portion of the fifth report, reprint (Calcutta - 1962) Page No - 183*

১৯. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) - প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (প্রথম খণ্ড), ফার্মা কে.এল.মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, প্রথম সংস্করণ ১৯৭০, কলি - ১২, ভূমিকা অংশ, পৃষ্ঠা নং -১ ০

২০. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) - প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (প্রথম খণ্ড), ফার্মা কে.এল.মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, প্রথম সংস্করণ ১৯৭০, কলি - ১২, কেনা ডাকাতের পালার ভূমিকা অংশ, পৃষ্ঠা নং -২৫১

২১. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) - প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (প্রথম খণ্ড), ফার্মা কে.এল.মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, প্রথম সংস্করণ ১৯৭০, কলি - ১২, আয়না বিবির পালা, পৃষ্ঠা নং - ৩২০

২২. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) - প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (প্রথম খণ্ড), ফার্মা কে.এল.মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, প্রথম সংস্করণ ১৯৭০, কলি - ১২, শ্যাম রায়ের পালা, পৃষ্ঠা নং - ৩৫৮

২৩. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) - প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৪র্থ খণ্ড), ফার্মা কে.এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, প্রথম সংস্করণ-১৯৭২, কলি - ১২, রঙ্গমালা সুন্দরী-চৌধুরীর লড়াই পালা, পৃষ্ঠা নং-১৫

২৪. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) - প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৭ম খণ্ড), ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, প্রথম প্রকাশ - ১৯৭৫, কলি - ১২, সন্নমালার পালার ভূমিকা অংশ, পৃষ্ঠা নং - ১০৩

২৫. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (সম্পাদিত) - প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৩য় খণ্ড), - ফার্মা কে.এল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, প্রথম প্রকাশ - ১৯৭১, কলি - ১২, সুনাইসুন্দরী পালার ভূমিকা অংশ, পৃষ্ঠা নং - ২৯৩

——